

হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন কোন পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গম্বরের সম্প্রদায় মিথ্যারোপের অপরাধে আঘাতে পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্বরগণকে আঘাত থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু মুক্তিতর্কে তাঁরাই সর্বদা উর্ধ্বে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত খানজী (রহঃ)—এর ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ঘৃণিত দস্যু কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারী কর্মকর্তা খোদা-প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হযত দস্যুকে তোষামোদ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সূতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তিসত্ত্বেও শাসিত এবং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টিই হযরত ইবনে-আব্বাস সৎক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ان لم ينصروا في الدنيا ينصروا في الآخرة — (যয়নুল-কোরআন)

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামে মাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে جندنا (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহর সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিজয় নির্ভরশীল।

وَأَذَانًا لِّسَاحَةِ قَوْمٍ مُّسَدِّدِينَ — (যখন সে আঘাত

তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবী বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। ‘‘সকাল’’ বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণতঃ এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রসুলুল্লাহ (সাঃ)—ও তাই করতেন। তিনি কোন শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।—(মায়হারী) হাদীসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলী উচ্চারণ করেন : الله اكبر خربت خيبر ، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (অর্থাৎ, আল্লাহ্ মহান। খয়বর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়।)

উপরোক্ত ১৮০-১৮২ আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্যে বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এই সর্বাঙ্গীণ তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তওহীদের

বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ্ তাআলা সেগুলো থেকে পবিত্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর পুংখানুপুংখরূপে কাফেরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ মুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

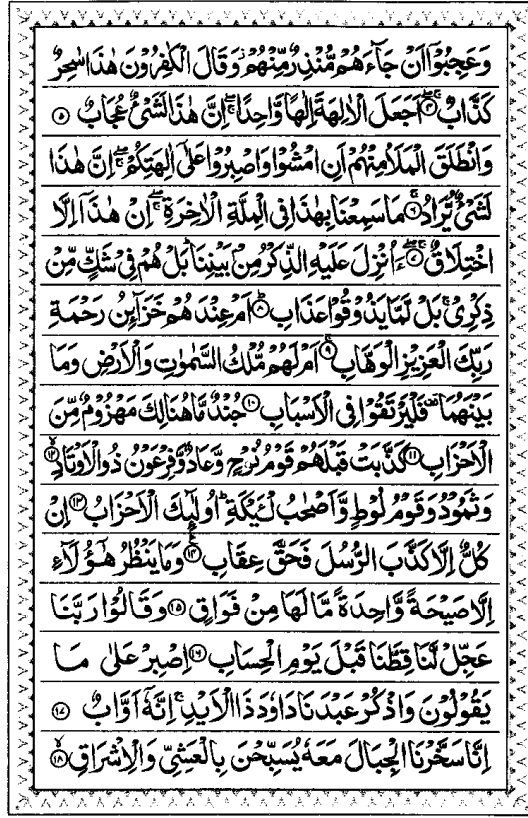
এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনয়াদী বিশ্বাস—তওহীদ ও রেসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। সেমতে আল্লামা কুরতুবী এক্ষেত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)—এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন : আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে নামায সমাপনান্তে سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ এই আয়াত তিনটি তেলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রাঃ)—এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াতত্রয় তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।— (তফসীর ইবনে-কাসীর)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সূরা ছোয়াদ

শানে মুমূল : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, রসুলুল্লাহ—করীম (সাঃ)—এর পিতৃব্য আবুতালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা-শোনা ও হেফায়ত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবু জহুল, আ'স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াশুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালেব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)—এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবে : আবু তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ (সাঃ)—এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবু তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)—এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল : আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। অথচ রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাদের



(৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর। (৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৬) তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রশ্ন করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রসোদিত। (৭) আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল? বস্তুতঃ ওরা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দিহান; বরং ওরা এখনও আমার মার আশ্বাদন করেনি। (৯) না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। (১১) এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন, (১৩) সামুদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা। এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেরই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১৫) কেবল একটি মহানদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (১৬) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাণ অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (১৭) তারা যা বলে তাতে আপনি সবার করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত;

দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের সৃষ্টাও নয়, অনুদাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আবু তালেব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন : আতুশুত্র, এ কোরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর এবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কোরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : চাচাজান, “আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?” আবু তালেব বললেন : সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন : আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশুর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবু জহ্ল বলে উঠল : বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : ব্যস “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল : আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেও সুরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَائِكَةُ — (তাদের সরদাররা একথা বলে প্রশ্ন করল) — এতে উল্লেখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদে দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَائِكَةُ এর শাব্দিক অর্থ “কীলকওয়াল ফেরাউন”। এর তফসীরে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন : এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত ধানভী (রহঃ) এর তরজমা করেছেন—“যার খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল।” কেউ কেউ বলেন : সে মানুষকে চিং করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিছু ছেড়ে দিত। এটা ই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন : সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন : এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল।—(কুরতুবী)

أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ এটা مَهْرُومُونَ الْأَحْزَابِ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ, এ আয়াতে যেসব দলের ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত ধানভী (রহঃ) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ, প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায়ই ছিল আদ, সামুদ প্রমুখ। তাদের যোকাবেলায় মঙ্গল মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। তারাই যখন খোদায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে?—(কুরতুবী)

مِمَّا هُمْ قَرَابِقٌ এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) একবার দুঃস্থ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুঃস্থ আসার মধ্যবর্তী সময়কে قَرَابِقٌ বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিকার ফুঁক

অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।—(কুরতুবী)

عَجَلْنَاكَ আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলীল দস্তাবেজকে **فَط** বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি “অংশ” অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা—ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।

কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রোপের কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্দ্বনার জন্যে আল্লাহ তাআলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সবার শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আঃ)—এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَإِذْ نُرَعِمَدًا دَاوُدَ الْكَرِيمِ — (স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী।) প্রায় সমস্ত তফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দাউদ (আঃ) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। (نِشَاحُ تِنِي أَلْبَانِيهِ دِيكِي عَرَاتِي) (নিশচয় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।) বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায ছিল দাউদ (আঃ)—এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আঃ)—এর রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ এবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ (আঃ) আল্লাহর দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।—(ইবনে-কাসীর)

এবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশী হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোযায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু একদিন পর পর রোযা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ এবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ — এ আয়াতে দাউদ (আঃ)—এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের এবাদতে ও তসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ পাঠকে আল্লাহ তাআলা এখানে দাউদ (আঃ)—এর প্রতি নেয়ামত

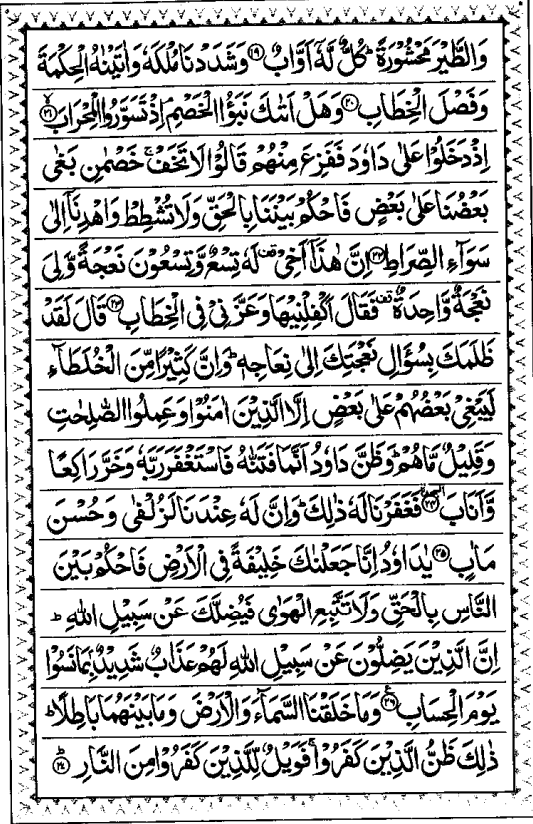
হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ (আঃ)—এর প্রতি নেয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হত?

এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ (আঃ)—এর একটি মো'জ্জিয়া প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, মো'জ্জিয়া এক বড় নেয়ামত। এছাড়া হযরত খানভী (রহঃ)—এর এক সুস্বপ্ন জওয়াবে বলেন : পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহর ফলে যিকরের এক বিশেষ আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে এবাদতে স্মৃতি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্গবদ্ধ যিকরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিকরের বরকত পরম্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সুফী বুয়ুর্গগণের মধ্যে যিকরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে যিকরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ যিকর করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও এবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়।—(মাসায়েলে মূলক)

চাশতের নামায : بِالْمَيْمُونِ وَالْإِشْرَاقِ যোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে **عَشِي** বলা হয়। আর **إِشْرَاق** এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এই আয়াতকে চাশতের নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। চাশতের নামাযকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে এশরাকও বলেন। পরবর্তীতে “সালাতে আওয়াবীন” নাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের জন্যে এবং ‘সালাতে এশরাক’ নাম সূর্যোদয় স্লেগ্ন দুই অথবা চার রাকাত নফল নামযের জন্যে অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশতের নামায দুই রাকাত থেকে বার রাকাত পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামায নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ্ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরী করে দেবেন।—(কুরতুবী)

আলেমগণ বলেন : চাশতের নামায দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্যে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকাত হওয়াই শ্রেয়। কেননা, চার রাকাত পড়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নিয়ম ছিল।



(১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা। (২১) আপনার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাঁড়ের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল : ভয় করবেন না; আমরা বিবাদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুস্খার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুস্খার। এরপরও সে বলে : এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। (২৪) দাঁড় বলল : সে তোমার দুস্খাটিকে নিজের দুস্খাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাঁড়ের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল। (২৬) হে দাঁড়! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়। (২৭) আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, জাহান্নাম।

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ - (আমি তাকে হেকমত ও

ফয়সালাকারী বাগ্মীতা দান করেছি।) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ, আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হেকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুওয়ত। وَفَصَّلَ الْخِطَابِ এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মীতা। হযরত দাঁড় (আঃ) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর بعد اما শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত খানভী (রহঃ) যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থ একত্রিত থাকতে পারে।

আলোচ্য ২১-২৫ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা হযরত দাঁড় (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এবাদতখানায় বিবাদমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন এক বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। দাঁড় (আঃ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাঁড় (আঃ) সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করতেন এবং কোন সময় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাঁড় (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গম্বরের এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেননি। আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লেখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাক্ফে ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে -
 اللَّهُ مَا ابَهُمَا ۖ অর্থাৎ, আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলাবাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী (রহঃ) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন : মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাঁড় (আঃ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে উল্টো শাস্তি দিত। আল্লাহ তাআলা হযরত দাঁড়

(আঃ)—কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনে।

হযরত দাউদ (আঃ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ্ তাআলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।—(বয়ানুল-কোরআন)

কোন কোন তফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। দাউদ (আঃ) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত সম্মানিত পয়গম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না এ কারণেই তিনি পরে হুশিয়ার হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন।—(রুহুল-মা'আনী)

কেউ কেউ বলেন : হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর গৃহের কোন না কোন ব্যক্তি এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নিবেদন করলেন : হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার এবাদত, যিকর ও তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ্ বললেন : দাউদ, এটা আমার দেয়া তওফীকের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নেই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তির পর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। দাউদ (আঃ)—এর এবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচী বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন এবাদত ও যিকরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আঃ) বোঝতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে এবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকমে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়।—(আহকামুল কোরআন)।

উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকদ্দমাটি কাল্পনিক নয়—সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আঃ) —এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তফসীরবিদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয়—ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা দাউদ (আঃ)—এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন যাতে দাউদ (আঃ) নিজের ভুল বোঝাতে পারেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোন কোন উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।—(রুহুল মা'আনী, তফসীরে আবু সউদ, যাদুল মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি।)

رُدُّوهُ إِلَى الْكُرْبَىٰ (যখন তারা এবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করল।) محراب আসলে বাড়ীর উপর তলা অথবা কোন গৃহের

সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা এবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কোরআনে এটি এবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ুতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকার মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমলে ছিল না।—(রুহুল মা'আনী)

فَقَرَّبَهُمْ (হযরত দাউদ (আঃ) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।) ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণতঃ মন্দ অভিশ্রায়ই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয় : এ থেকে জানা গেল যে, কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেয়া অবশ্যই মন্দ। কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতঃপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আঃ) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেয়ার আশংকায় হয়ে থাকে। আরবীতে একে خوف বলা হয়। দ্বিতীয় ভয় কোন মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবীতে একে خشية বলা হয়। (মুফরাদাতে রাগিব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ্ ব্যতীত কারও জন্যে হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিত وَاللَّائِيَاتِ (তারা বলল : আপনি ভীত হবেন না।) আগস্তুকরা একথা

বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং দাউদ (আঃ) চুপচাপ তাদের কথা শুনে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগস্তুকদের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু দাউদ (আঃ) আসল ব্যাপার জানার জন্যে অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবতঃ এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَاللَّائِيَاتِ (এবং অবিচার করবেন না।) আগস্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যতঃ ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতঃপর এসেই দাউদ (আঃ)—এর মত মহান পয়গম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া—এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডস্বানহীনতা। কিন্তু দাউদ (আঃ) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেননি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ষৈর্ষ ধরা উচিত : এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তায় ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ষৈর্ষ ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবী। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।—(রুহুল মা'আনী)

—(দাউদ (আঃ))

বললেন, সে তোমার দুশ্মীকে তার দুশ্মাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অন্যায্য করেছে।) এখানে দু'টি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য—
(১) হযরত দাউদ (আঃ) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন—বিবাদীর বিবৃতি শুনে ননি। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। দাউদ (আঃ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথা শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতী মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই দাউদ (আঃ) বিচারকের পদমর্যাদায় নয়—মুফতীর পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতীর কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং, প্রশ্ন মোতাবেক জওয়াব দেয়া।

কাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন :

وَأَنَّ كِرْيَانَ السُّلْطَانِ لِيَتَّقِي بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (শরীকদের
অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলা হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি কোন কাজ-কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। কোন সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যিক।

وَكُلٌّ كَاوَدُ الْكَاذِبِينَ (দাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আঃ) এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকলেও উভয় পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্যে বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দিষ্ট মনে নিয়েছে।

যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্যে দাউদ (আঃ) এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ (আঃ) এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারত। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। দাউদ (আঃ) ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসল এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে গেল।

فَأَسْتَفْرَقُوا وَحَزَّوْا كَمَا وَكَلَبِ (অতঃপর তিনি তাঁর পরওয়ান-
দেগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন।) এখানে “রুজু” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজেব হয়।

—(নিশ্চয় দাউদের জন্যে আমার

কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকূর পর আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল-ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আঃ) এর বিচুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হল? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা “সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের” কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভুলত্রাস্তি সম্পর্কে হুশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্যে এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

০ হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাযও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য ২৬ নং আয়াতে শাসন কার্যের জন্যে তাঁকে একটি মৌলিক পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশ নামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

(১) আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, (২) সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, (৩) এ কর্তব্য পালনের জন্যে নফসানী খেয়ালখুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তাআলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্যে আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহর আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য : এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদি ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম : তাই সে শাসনকার্যের জন্যে সেসব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্ব যুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্ব যুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে—এ ব্যাপারে

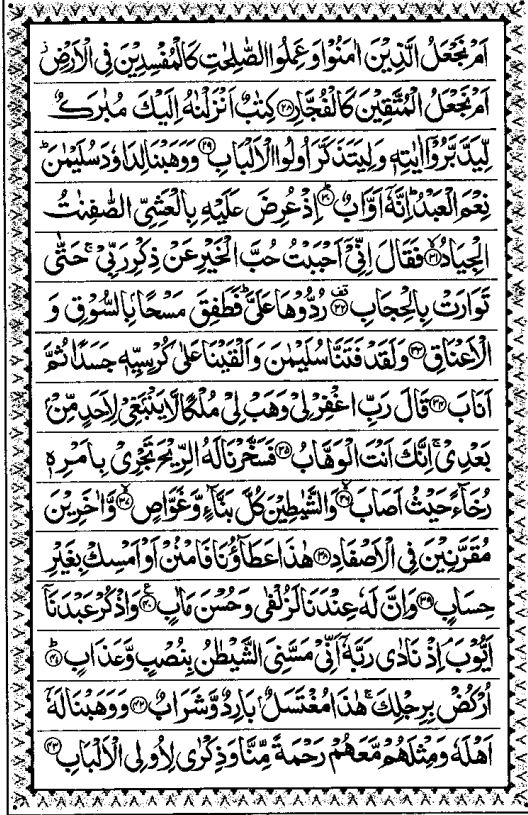
অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়নি যা কোন কালেই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসকবর্গের বিশৃঙ্খতা ও সততার পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্ত্বা বিলোপ করা সম্ভব। কোন যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশৃঙ্খতা ও সততার দাবী কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মু'মেনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল মু'মেনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'খেয়াল-খুশীর' অনুসরণ করা না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়ম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশীর দূরস্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্রপথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশীর উপস্থিতিতে কোন উৎকৃষ্টতার আইনব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়ম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র : এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্যে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে খোদাভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে খোদাভীতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়।

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা : আলোচ্য ২৭-২৯ নং আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষতঃ পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম রাযী বলেন : যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাপনতঃ কোন বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজ্ঞানোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্যে এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনার পূর্বে কাকেরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা **وَالْوَارِثُ يَبْتَغِي غَيْرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِمْ لَنَا وَكُنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ** আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এক পরকালের প্রতি বিদ্রোহ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, **إِصْرٍ عَلَىٰ مَا يَكْفُرُونَ وَأَدْرَأُكُمْ عَذَابًا دُونَ** (তাদের কথাবার্তায় সবার করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে সুরা করুন।) এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা একথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে কয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অনুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শান্তি দিতে বলে, সে কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে ইক্যাবার পরিবর্তে পাপাচারীদেরকে শান্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবী এবং এটাই জঙ্গ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে কেয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোকভাবে এ দাবীই করে যে, এ জঙ্গ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ জীবন যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মনে নিতে পারে না।



(২৮) আমি কি বিশাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাতীকদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব। (২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুঝিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (৩০) আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩১) যখন তার সামনে অপরাধে উৎকট অশুরাজি পেশ করা হল, (৩২) তখন সে বলল : আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি—এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। (৩৪) আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিশাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হল। (৩৫) সোলায়মান বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবশ্যে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। (৩৭) আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। (৩৮) এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবহাওয়ায় শক্তিশালী। (৩৯) এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব, এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও—এর কোন হিসেব দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি। (৪১) স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল : শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। (৪২) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। ঝরণা নিগত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। (৪৩) আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুঝিমানদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—(আমি কি বিশাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহেয়গারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ, এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলীর ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা মুমিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তিপ্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেরের পার্শ্ব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না, বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেয়া যেতে পারে। সেমতে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেয়া হবে।

০ আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতসমূহে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) অশুরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় আসার অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সন্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশু যবেহ করে দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহর স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, পয়গম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয নামায হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ হয় না। কিন্তু সোলায়মান (আঃ) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলোচ্য এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ুতী বর্ণিত রসূলে করীম (সাঃ)-এর এক উক্তি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশুরাজি আল্লাহ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। তফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশুরাজি সোলায়মান (আঃ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরীয়তে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশু কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশুরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহর নামে কোরবানী করেছেন।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরী অশুরাজি পরিদর্শনের নিমিত্ত পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেন : এই অশুরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান, তা পার্শ্ব মহব্বতের কারণে নয় ; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ, এগুলো জেহাদের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে। জেহাদ একটি উচ্চস্তরের এবাদত। ইতিমধ্যে অশুরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন : এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশুরাজির

গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

এই তফসীর অনুযায়ী عَنْ دُرِّ الْوَيْدِ বাক্যে عَنْ কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং دُرِّ الْوَيْدِ এর সর্বনাম দ্বারা অশুরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে مَسَّح এর অর্থ কর্তন করা নয়; বরং আদর করে হাত বুলালেন।

প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কোরআন পাকের ভাষ্যদৃষ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য কিরিয়ে আনার কাহিনী : কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলম্বন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ তাআলার কাছে অথবা ফেরেশতাপনের কাছে সূর্যকে পুনরায় কিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে কিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত এবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অন্তর্মিত হয়। তাদের মতে ﴿٥٧﴾ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু আল্লামা আলুসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী স্বপ্ন করে বলেছেন : ﴿٥٧﴾ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশুরাজিই বোঝানো হয়েছে— সূর্য নয়। এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় কিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার নেই; বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য নয়।—(রুহুল মা'আনী)

আল্লাহর সূর্যে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শান্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্বাদাবোধের দাবী : সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শান্তি দেয়ার জন্যে কোন মুবাহ্ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া জায়েয। সূফী ব্যুর্গগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

কোন সংকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে নিজের উপর এ ধরনের শান্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হুযুরে আকরাম (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু জুহায়ম (রাঃ) তাঁকে একটি শাযী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা, নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।—(আহকামুল-কোরআন)

এমনিভাবে হযরত আবু তালহা (রাঃ) একবার তাঁর বাগানে নামাযরত অবস্থায় একটি পাখী দেখে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্যে বৈধ শান্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েয নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (রহঃ) একবার এ ধরনের শান্তি হিসেবে তাঁর বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্যব শে'রানী (রহঃ)—এর মত অনুসন্ধানী সূফী ব্যুর্গগণ তাঁর এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা

দেননি।—(রুহুল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজত্বের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিত : এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশুরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)—এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক এবাদতের সময় অন্য এবাদতে মশগুল থাকা ভুল : এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক এবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য এবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। কলাবাহুল্য, জেহাদের অশু পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম এবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ এবাদতের পরিবর্তে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আঃ) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফেকাহবিদগণ লিখেন : জুমআর আযানের পর যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েয নয়, তেমনি জুমআর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তেলাওয়াতে কোরআন অথবা নফল পড়ার এবাদত হয়।

০ আলোচ্য ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত সোলায়মান (আঃ)—এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিশাণ দেহ সোলায়মান (আঃ) — এর সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছিল। এখন সে নিশাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিতাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোন সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। তার বিশদ বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সোলায়মান (আঃ)—কে কোনভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহর দিকে আরও বেশী রুজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের আঙ্গল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়াজেত থেকে গৃহীত। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)—এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি ক্রায়ত্ত্ব করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (আঃ)—এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহরূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আঃ) সে আংটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়াজেতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তফসীরগ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর এ ধরনের সমস্ত রেওয়াজেতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন :

“আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আঃ)—কে পয়গম্বুর বলেই মানে না। বাহ্যতঃ এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।” সুতরাং এ ধরনের রেওয়াজেতকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলা কিছুতেই জায়েয নয়।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই : একবার হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তারা আল্লাহর পক্ষে জেহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি “ইনশাল্লাহ্” বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গম্বরের এ ক্রটি আল্লাহ তাআলা পছন্দ করলেন না এবং আল্লাহ পাক তাঁর এ প্রয়াস নিশ্চল করে দিলেন। ফলে বিবিস্বরের মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পাশুবিহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন : সিংহাসনে নিষ্ঠাশ্রম দেহ রাখার অর্থ এই যে, সূলায়মান (আঃ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সূলায়মান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আলুসী প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ তফসীরবিদও এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনের তদনুরূপ তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তফসীর বলা যায় না। কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়াজেতের মধ্যে কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জেহাদ, কিতাবুল-আশ্বিয়া, কিতাবুল-আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ের একাধিক তরিকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুল-তফসীরে সূরা ছোয়াদের তফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبِي لِي مَوْلًى আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়াজেত উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ এই হাদীসের কোন বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর নয়। বরং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন আয়াতের তফসীর হওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় এক তফসীর ইমাম রাযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন একটি নিষ্ঠাশ্রম দেহ সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্যে নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যেও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তফসীরও অনুমানভিত্তিক। কোরআন পাকের ভাষ্যের সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোন রেওয়াজেতও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্যে আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা সোলায়মান (আঃ)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে অধিকতর রুজু হয়েছে।

কোরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাগুয়াত দেয়া যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও সোলায়মান (আঃ)-এর মত আল্লাহ তাআলার দিকে পূর্বাশ্রম অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সোলায়মান (আঃ)-এর পরীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তাআলার উপর সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

وَهَبِي لِي مَوْلًى لِّأَحْسِنَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ — (আমাকে এমন

সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না)। কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাঁদের মতে ‘আমার পরে’ শব্দটির অর্থ ‘আমাকে ছাড়া’। হযরত খানভীও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায়। হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তী কালে কেউ হতে পারেনি। কেননা, বাভাস অধিনস্ত হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি। কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর জিন বশীভূত করণের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু’একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়; কিন্তু সূলায়মান (আঃ) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়ম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়ম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া : এখানে সুরণ রাখা দরকার যে, পয়গম্বরের কোন দোয়া আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সূলায়মান (আঃ) এ দোয়াটিও আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতালভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমন্বিত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সূলায়মান (আঃ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যেই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেয়া হয় এবং তা কবুলও করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমন্বিত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্যে রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ।—(রুহুল মা’আনী)।

مُرِّيَنِي فِي الصَّلَاةِ — (শৃঙ্খলিত অবস্থায় —) জিন জাতিতে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে সূলায়মান (আঃ) শেকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরী নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্ৰাহ্য লোহার শেকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্যে অন্য কোন পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্যে এখানে শেকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

রসূলে করীম (সঃ)-কে সবার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে আইয়ুব (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা

ص ৩

২৫৫

২৩ মালী

وَحَدَّ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْتَدِثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
 نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ وَأَذْكُرْ عَبْدًا نَأْبًا لَمْ يَرْهَبِ اللَّهَ وَالنَّاسَ وَيَعُوبُ
 أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۝ إِنَّا أَخَصَّصْنَا لَهُمُ الْخَالِصَةَ ذِكْرَى الْكَافِرِ
 وَإِنَّمُمْ عِنْدَنَا مِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْخَيْرِ ۝ وَأَذْكُرْ سَاعِدًا وَ
 الْيَسَعَ وَذَلِكَ مِنَ الْأَخْيَارِ ۝ هَذَا ذِكْرُ وَإِنْ
 لِلْمُتَّقِينَ كَحَسَنِ بَابٍ ۝ جَدَّتْ عَدْنٌ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْإِنْوَابُ ۝
 مُتَكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِطَارِكَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝
 وَعِنْدَهُمْ قُصُورَاتُ الْطَّرِيقِ ۝ أَرْبَابٌ ۝ هَذَا مَا تَوْصَلُونَ لِيَوْمِ
 الْحِسَابِ ۝ إِنَّ هَذَا رِزْقًا مَالَهُ مِنْ تَعَادٍ ۝ هَذَا وَإِنْ
 لِلظَّالِمِينَ لَسْرَمًا ۝ لِيَجْزِيَ صَوْلَانَهَا فَيَسْأَلُ الْيَهُادُ ۝ هَذَا
 فَلْيَدْرُؤُوا حَيْبَهُمْ وَعَسَائِلُ ۝ وَأَخْرَجْنَا سَكْبَةَ أَرْوَابٍ ۝ هَذَا
 قَوْمٌ مُفْسِدُونَ مَعْلُومٌ لَمْ يَرْجَبُوا إِلَيْهِمْ ۝ أَمْ سَأَلُوا النَّارَ ۝ قَالَُوا
 بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَجَابِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَنَّمُوا لَنَا فَيَسْأَلُ الْقَرَارِ ۝
 قَالَوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَدَابًا صَعْفًا فِي النَّارِ ۝
 وَقَالُوا مَا لَنَا لَأَنْزَى رَجَا لَكُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝

(৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদুদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ তন্ত্র করো না। আমি তাকে সেলাম সবারকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৪৫) স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। (৪৬) আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। (৪৭) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সংলোকদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮) স্মরণ করুন, ইসমাইল, আল ইয়াসা' ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। (৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। খোদাতীরুদের জন্যে রয়েছে উত্তম ঠিকানা—(৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের জন্মাত; তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। (৫২) তাদের কাছে থাকবে আনন্দনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। (৫৩) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্যে। (৫৪) এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (৫৫) এটা তো শুনলে, এখন দুইদের জন্যে রয়েছে নিকট ঠিকানা (৫৬) তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকট সেই আবাসস্থল। (৫৭) এটা উত্তম পানি ও পুঞ্জ; অতএব তারা একে আস্থাদন করুক। (৫৮) এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৫৯) এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্পৃকন করেছ। অতএব, এটি কতই না ঘৃণ্য আবাসস্থল। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্পৃকন করেছ, আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। (৬২) তারা আরও বলবে, আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না।

আশ্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে—

سَتَقَى الشَّيْطَانُ يَنْصِبُ وَعَدَابٍ — (শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট

দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হযরত আইয়ুব (আঃ) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ আইয়ুব (আঃ)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল : আমাকে তার দেহ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেয়া হোক, যদ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ তাআলারও উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব (আঃ)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেয়া হল। অতঃপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন : কোরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইয়ুব (আঃ)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলেন, রুগ্নাবস্থায় শয়তান আইয়ুব (আঃ)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর রোগ কি ছিল? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইয়ুব (আঃ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এর কোন বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোন কোন সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাঙ্গে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঘৃণ্যভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্থাপু রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়াজেতের সত্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্বেক করার মত কোন রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোন সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়াজেত নির্ভরযোগ্য নয়।—(রুহুল-মা'আনী, আহ্কামুল কোরআন থেকে সংক্ষেপিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَحَدَّ بِيَدِكَ ضَعْفًا — (তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও।)

আইয়ুব-পত্নীর প্রতি আল্লাহ তাআলার এই বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা কয়েকটি মাসআলা জানা যায়।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়ুবের (আঃ) অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইয়ুবের (আঃ) পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একখার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাঁকে আরোগ্য দান করেছি। এ স্বীকৃতিটুকু

ছাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাই না।

স্ত্রী হযরত আইয়ুবকে একথা বললে, তিনি বললেন,—তোমার সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল।

এ ঘটনার বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক এমন একটা প্রস্তাব তাঁর সামনে উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ, প্রস্তাবটা ছিল শেরেকীতে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বসলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব।

সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, কছম ভঙ্গ করো না, বরং হাতে এক মুঠো তপশলাকা নিয়ে তদ্বারা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে কছম পূর্ণ কর।

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একশ বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরী করে নিয়ে তদ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফার মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন যে, এর জন্যে দু'টি শর্ত রয়েছে—(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে লাগতে হবে এবং (২) এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত ধানতী বয়ানুল-কোরআনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবতঃ তাই। নতুবা হনাকী ফকীহগণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়।—(ফতহুল কাদীর)

শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল : দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোন অসমীচীন অথবা মাকরুহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শরীয়তসম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। বলাবাহুল্য, হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবী এই যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাপ্রদায় করেছিলেন, তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আইয়ুব (আঃ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু সুরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েয যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্যে বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূলপ্রাপ বজায় রেখে নিজের জন্যে হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েয। উদাহরণতঃ যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্যে কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজেব হয় না। এরূপ কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয় তো যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।—(ফতহুল-মা'আনী)।

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা : তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন অসমীচীন, ব্রাহ্ম অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজেব না হত, তবে আইয়ুব (আঃ)-কে কৌশল শিখানো হত না। এতদসঙ্গে সুরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা।

أُولَى الْأَكْبَرَى وَالْأَصْغَرَى —এর শাস্তি অর্থ তাঁরা হস্ত ও দৃষ্টিবিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাভাবিক গুণ : ذِكْرُ الْمَوْلَى —শাস্তি অর্থ গৃহের সুরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব, পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। কোন কোন খোদাশ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তিসমূহকে ভেঁতা করে দেয়।

হযরত আল ইয়াসা (আঃ) : وَالْيَسَمَةِ (আল ইয়াসা [আঃ]-কে সুরণ করুন।) হযরত আল ইয়াসা' (আঃ) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানে ও সূরা আনআমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস (আঃ)-এর পর তাঁকেই নবুওয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইলিশ' ইবনে সাকেত উল্লেখিত হয়েছে।

وَعَنْدَهُمْ ظُهُورُ الْمَطَرِ الْمَرْثَى —(তাদের কাছে আনতনয়না সম বয়স্কা রমণীগণ থাকবে।) অর্থাৎ, জন্মান্তের হরণ থাকবে। "সমবয়স্কা"—এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে—সপত্নীসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলাবাহুল্য, এটা স্বামীদের জন্যে পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম : দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতুহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।



(৬৩) আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (৬৪) এটা অর্থাৎ, জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যস্বাভাবী। (৬৫) বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মাজনাকারী। (৬৭) বলুন, এটি এক মহাসংবাদ, (৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (৬৯) উর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। (৭০) আমার কাছে এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৭১) যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৭২) যখন আমি তাকে সূক্ষ্ম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্প্রক্ষে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো। (৭৩) অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল, (৭৪) কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্প্রক্ষে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? (৭৬) সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ্ বললেন: বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুমি অভিশপ্ত। (৭৮) তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৭৯) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৮০) আল্লাহ্ বললেন: তোকে অবকাশ দেয়া হলু (৮১) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৮২) সে বলল, আপনার ইযযতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।

সূরার সার-সংক্ষেপ : قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ এ সূরার আসল লক্ষ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রেসালত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবী খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে—(এক) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সাস্তুনা দেয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মত আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবার করুণ। (দুই) এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গম্বরের রেসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অঙ্কন করে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ, কেয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিশপ্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবী অর্থাৎ, রেসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেয়া হয়েছে।

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (উর্ধ্ব জগতের কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ, আমার রেসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জ্ঞানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তাআলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিল, اجْعَلْ فِيهَا مِمَّنْ تُسْجِدُ فِيهَا وَسِعَتِكَ

اللَّيْمَاءُ — আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাস্তিক অর্থ “ঝগড়া করা” অথবা “বাকবিতণ্ডা করা।” অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশে ছিল না, বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জ্ঞানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اختصام শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশতঃ এ প্রশ্নোত্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ — (যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন) এখানে আল্লাহ্ তাআলা ও ফেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশতঃ আদম (আঃ)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।— (তফসীরে-কবীর)

لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي - এখানে আদম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন